

মতামত

সুরঞ্জ কাকা একজন মানুষ, এক জীবন্ত প্রতিষ্ঠান

হারানো সোনালি সেই দিনগুলি

প্রতিবেদক: লেখক: কবীর আহমেদ ভূঁইয়া

প্রকাশের তারিখ: রোববার, ৩০ আগস্ট ২০২৬, ০৫:২৩ PM



প্রতিটি গ্রামেরই কিছু মানুষ থাকেন, যাঁরা শুধু একজন ব্যক্তি নন—পুরো গ্রামেরই একেকটি প্রতিষ্ঠান। তাঁদের উপস্থিতিতে একটি গ্রাম প্রাণ পায়, তাঁদের স্মৃতিতে একটি গ্রামের ইতিহাস পূর্ণতা লাভ করে। আমাদের গ্রামে তেমনই একজন মানুষ ছিলেন—সুরঞ্জ কাকা।

আমার শৈশবের স্মৃতির পাতায় যতবার ফিরে যাই, সবার আগে ভেসে ওঠে তাঁর সাদা দাড়িতে ঘেরা হাসিমাখা মুখটি। দুধের মতো ফর্সা গায়ের রং, মুখভর্তি শুভ্র দাড়ি, আর একটি চোখ—যেটি চিরদিনের জন্য নিভে গিয়েছিল।

গ্রামের প্রবীণদের মুখে শুনেছিলাম, যৌবনে এক সূর্যগ্রহণের সময় কৌতূহলবশত তিনি খালি চোখে সূর্যের দিকে তাকিয়েছিলেন। সূর্যের তীব্র আলো তাঁর একটি চোখের দৃষ্টি চিরতরে কেড়ে নিয়েছিল। ছোটবেলায় গল্পটি শুনে বিস্মিত হতাম। আজ বুঝি, একটি চোখ হারিয়েও তিনি এমন এক অন্তর্দৃষ্টি অর্জন করেছিলেন, যা অনেক দু'চোখওয়ালা মানুষের ছিল না।

সুরুজ কাকা দুইবার বিয়ে করেছিলেন। ছোট চাচি, অর্থাৎ রহিমা বুবুর মাকে নিয়ে তাঁর ছোট সংসার ছিল শান্ত, পরিপাটি আর ভালোবাসায় ভরা। বিত্তের প্রাচুর্য ছিল না, কিন্তু অভাবও যেন কখনো সেই সংসারের দরজায় স্থায়ীভাবে দাঁড়াতে পারেনি। কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন—পরিশ্রমই মানুষের সবচেয়ে বড় সম্পদ, আর সততাই তার সবচেয়ে বড় পরিচয়।

সপ্তাহে দুই দিন আখাউড়া ও মুগরা বাজারে হাট বসত। হাট থেকে তিনি কাঁধে করে বাঁশ নিয়ে রাতের অন্ধকারে বাড়ি ফিরতেন। পরদিন ভোর হতেই শুরু হতো তাঁর শিল্পীর মতো নিখুঁত কর্মযজ্ঞ। সেই বাঁশ কেটে, চিরে, মসৃণ করে তিনি তৈরি করতেন মাছ ধরার আনতা, চাই, পলো, মাছ রাখার ডুলা, বাঁশের পাটি, কুলা, উড়া, ঝুড়ি, যুখুনি—কত রকমের যে প্রয়োজনীয় জিনিস! তাঁর হাতের ছোঁয়ায় সাধারণ একটি বাঁশও যেন মানুষের জীবনের অপরিহার্য সম্পদে পরিণত হতো।

সকাল গড়াতেই তাঁর উঠানটি যেন গ্রামের অনানুষ্ঠানিক সভাস্থলে রূপ নিত। একে একে এসে হাজির হতেন অলিখা কাকা, মুতি ভাই, সাহেব আলী কাকা, মকবুল কাকা, ইউনুস দাদা, দারু কাকাসহ গ্রামের অসংখ্য মুরব্বি। কেউ বাঁশ চিরে দিতেন, কেউ কঞ্চি বানাতেন, কেউ বেত বুনতেন। আর কাজের ফাঁকে চলত গল্প, হাসি, তর্ক, সূতিচারণ, গ্রামের সুখ-দুঃখের আলোচনা।

আজ ভাবলে মনে হয়, ওটাই ছিল আমাদের গ্রামের প্রকৃত সংবাদকেন্দ্র। কার বাড়িতে অতিথি এসেছে, কার ধান কেমন হয়েছে, কোথায় বিয়ের আয়োজন, কে অসুস্থ, কার কী প্রয়োজন, কার বনের কুঞ্জি বিক্রি হবে, কার গাভী কতটুকু দুধ দিচ্ছে—সব খবর যেন সবার আগে পৌঁছে যেত সুরুজ কাকার উঠানে।

সেখানে কোনো সংবাদপত্র ছিল না, ছিল না টেলিভিশন কিংবা মোবাইল ফোন। অথচ মানুষ একে অপরের খবর রাখত হৃদয়ের টানে। সম্পর্কগুলো ছিল এতটাই গভীর যে খবর পৌঁছাতে প্রযুক্তির প্রয়োজন হতো না।

মাঝেমধ্যে সুরুজ কাকা একটু বিরক্তির ভান করে বলতেন,
□ "তোমরা একটু কাজ করতে দিবা, না শুধু গল্পই করবা?"

কথাটা বললেও তাঁর ঠোঁটের কোণে লুকিয়ে থাকত মৃদু হাসি। কারণ তিনিও জানতেন, এই মানুষগুলোর উপস্থিতিই তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় আনন্দ। আর গ্রামের লোকজনও তাঁর সেই কৃত্রিম বিরক্তিকে কখনো গুরুত্ব দিত না। বরং আরও কাছে বসে হাসতে হাসতে কাজের গতি বাড়িয়ে দিত। এ ছিল ভালোবাসার এক অদ্ভুত ভাষা—যার কোনো অভিধান নেই, কোনো ব্যাকরণ নেই; ছিল শুধু হৃদয়ের টান।

সারা সপ্তাহ ধরে তৈরি করা জিনিসপত্র তিনি বাজারে নিয়ে বিক্রি করতেন। তবে অনেক সময় বাজারে যাওয়ার আগেই গ্রামের মানুষ তাঁর উঠান থেকেই প্রয়োজনীয় জিনিস কিনে নিয়ে যেত। এতে তাঁর যেমন সুবিধা হতো, গ্রামের মানুষেরও সময় বাঁচত। তখন অর্থের চেয়ে বিশ্বাসের মূল্য ছিল অনেক বেশি।

গ্রামের কেউ নতুন গাভী কিনতে গেলে প্রায় নিয়ম করেই সুরুজ কাকাকে সঙ্গে নিয়ে যেত। তিনি না যেতে চাইলে জোর করেই নিয়ে যাওয়া হতো। কারণ সবাই বিশ্বাস করত, গাভী চেনার চোখ তাঁর মতো আর কারও নেই। গাভী কিনে আনার পর আবার সেই গাভীকে ঘিরে চলত নতুন আড্ডা, নতুন আলোচনা। যেন একটি গাভী কেনাও গ্রামের মানুষের জন্য ছোট্ট এক উৎসব।

আমাদের পরিবারের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল আত্মীয়তার সীমা ছাড়িয়ে হৃদয়ের বন্ধনে গাঁথা। বাবা তখন প্রবাসে থাকতেন। সংসারের ছোটখাটো প্রয়োজন হলেই সুরুজ কাকা হাসিমুখে এগিয়ে আসতেন। বাজার-সদাই থেকে শুরু করে নানা কাজে তিনি যেন আমাদের পরিবারের একজন নীরব অভিভাবক হয়ে উঠেছিলেন।

আমার মায়ের হাতের রান্না তিনি ভীষণ পছন্দ করতেন। মা যখনই ভালো কিছু রান্না করতেন, তাঁর জন্য আলাদা করে পাঠিয়ে দিতেন। সুরঞ্জ কাকা সেই খাবার হাতে নিয়ে এমন আনন্দে হাসতেন, যেন পৃথিবীর সবচেয়ে মূল্যবান উপহারটি পেয়েছেন। আজ বুঝি, ভালোবাসা দিয়ে পরিবেশন করা এক প্লেট ভাতের স্বাদ কোনো রাজকীয় ভোজেও মেলে না।

আমাকে নিয়েও তাঁর ছিল এক অদ্ভুত মমতা। একদিন তিনি একটি স্বপ্ন দেখেছিলেন। ঘুম ভাঙার পর সেই স্বপ্নের কথা তিনি পরিবারের সবাইকে শুনিয়েছিলেন, পরে জীবিত থাকাকালীন আরও বহুবার আমাদের কাছে বলেছেন।

তিনি বলেছিলেন, স্বপ্নে তিনি দেখেছেন—আমার দাদা তাঁর কাছে এসেছেন। তিনি তাড়াতাড়ি একটি চেয়ার এগিয়ে দিয়ে দাদাকে বসতে অনুরোধ করলেন। কিন্তু দাদা সেই চেয়ারে বসলেন না। মৃদু হেসে বললেন, "এই চেয়ারে আমি বসব না। এই চেয়ারে আমার নাতি কবীর বসবে।"

সুরঞ্জ কাকা এই স্বপ্নটিকে শুধু একটি স্বপ্ন হিসেবে দেখেননি। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, আমি একদিন মানুষের মতো মানুষ হব। একজন প্রবীণ মানুষের সেই অকৃত্রিম আশীর্বাদ আজও আমার জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান পাথেয়।

আমার দাদার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত গভীর। দাদা যখনই কোনো কাজে ডাকতেন, তিনি সবকিছু ফেলে ছুটে আসতেন। দাদার মৃত্যুর পর যেন আমাদের পরিবারের পাশে থাকার দায়িত্ব নিজেই নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন। তাই আমাদের কাছে তিনি কখনো শুধু প্রতিবেশী ছিলেন না—ছিলেন পরিবারের একজন অভিভাবক।

প্রতিদিন সকালে আমরা মক্তব থেকে আরবি পড়ে বাড়ি ফিরতাম। দূর থেকেই ভেসে আসত সুরঞ্জ কাকার উঠানের প্রাণবন্ত কোলাহল। বাঁশ কাটার ঠকঠক শব্দ, মানুষের হাসি, গল্পের উচ্ছ্বাস, কখনো আবার প্রাণখোলা অট্টহাসি—সব মিলিয়ে উঠানটি যেন জীবনের এক চলমান উৎসব হয়ে উঠত। আজও সেই শব্দগুলো কানে বাজে।

সুরঞ্জ কাকার বাড়িতে ছিলেন আরেকজন অসাধারণ মানুষ—রহিমা বুবুর নানী, অর্থাৎ সুরঞ্জ কাকার শাশুড়ি। আমরা সবাই তাঁকে শুধু "নানি" বলেই ডাকতাম।

তাঁর বয়স তখন প্রায় একশ বছরের কাছাকাছি। কিন্তু সেই বয়সেও কী অদম্য প্রাণশক্তি! বাড়ির আশপাশের ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের তিনি সম্পূর্ণ বিনা পারিশ্রমিকে আরবি শিক্ষা দিতেন। প্রতিদিনই তাঁর ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বাড়ত। তাঁর কাছে বসেই আমরা শিখেছিলাম—শিক্ষা কোনো ব্যবসা নয়; শিক্ষা হলো মানুষের প্রতি এক মহান সেবা।

এদিকে আমাদের বাড়িতেও সকাল শুরু হতো ব্যস্ততায়। মা আর চাচিরা নাস্তা তৈরিতে ব্যস্ত। কেউ পুকুরঘাটে সবজি ধুচ্ছেন, কেউ চাল বাছছেন, কেউ চুলায় আগুন জ্বালাচ্ছেন। ধোঁয়ার সঙ্গে ভেসে আসত গরম ভাতের সুগন্ধ, ভাজা শুকনো মরিচের ঝাঁজ আর মায়ের স্নেহভরা ডাক।

এরই মধ্যে মক্তব ছুটি হয়ে যেত। ছোট ছোট বাচ্চারা দল বেঁধে বাড়ির পথে হাঁটতে শুরু করত। কারও হাতে কায়দা, কারও হাতে কাঠের তক্তা, কেউ হাঁটতে হাঁটতে পড়া মুখস্থ করছে, কেউ আবার দৌড়ে সবার আগে বাড়ি পৌঁছানোর প্রতিযোগিতায় মেতেছে। তাদের হাসি আর কোলাহলে গ্রামের মেঠোপথ যেন প্রাণ ফিরে পেরে। সেদিনও ছিল ঠিক তেমনই একটি সকাল।

আমার ছোট ভাই আব্দুর রহমান সানির নেতৃত্বে ছোট বোন নিপা, লিজা এবং আরও কয়েকজন শিশু মক্তব থেকে বাড়ির পথে ফিরছিল। কেউ হাতে কোরআন শরীফের কায়দা, কেউ তক্তা, কেউ আবার পড়া আওড়াতে আওড়াতে হাঁটছে। তাদের কেউই জানত না, সেই দিনের ছোট

একটি ঘটনাই একদিন আমার স্মৃতির পাতায় চিরস্থায়ী হয়ে থাকবে।

আর সেই ঘটনাই আমাকে প্রথম উপলব্ধি করিয়েছিল—একটি গ্রামের আসল শক্তি তার ঘরবাড়ি নয়, তার মানুষ। আর মানুষের সবচেয়ে বড় পরিচয় তার পারস্পরিক ভালোবাসা, আন্তরিকতা এবং একে অপরের পাশে নিঃস্বার্থভাবে দাঁড়ানোর মানসিকতা।

চলবে....

লেখক: কবীর আহমেদ ভূঁইয়া

রাজনৈতিক ও উন্নয়ন কৌশলবিদ। প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান, ভূঁইয়া গ্লোবাল ফাউন্ডেশন।

এ বিভাগের আরও খবর



বাংলাদেশ মহান, এই জয়গান পুরো পৃথিবীকে শোনাও
[বাংলাদেশ] এই একটি শব্দের মধ্যেই লুকিয়ে আছে হাজার বছরের সভ্যতার উত্তরাধিকার, নদীমাতৃক প্রকৃতির অপার সৌন্দর্য, মানুষের অদম্য সাহস, অসংখ্য আত্ম...



বঙ্গোপসাগর ঘিরে জটিল ভূ-রাজনীতি
বঙ্গোপসাগর শুধু একটি জলরাশি নয়; দক্ষিণ এশিয়ার অর্থনীতি, জ্বালানি নিরাপত্তা, সামুদ্রিক বাণিজ্য ও ভূ-রাজনীতির গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। সময়ের সঙ্গে...



১৯৭৫ সাল ছিল গণ-ইচ্ছার প্রতিফলন

ভুলাই বিগ্রব বাংলাদেশের রাজনীতি, প্রশাসন ও জীবনধারা পুরোপুরি বদলে দিয়েছে। সরকার ও বিশিষ্টজন এই আন্দোলনকে বিভিন্নভাবে মূল্যায়ন করছেন, যার অধি...



সনদ বাড়ছে, দক্ষতা কি বাড়ছে?

বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা হলে আমরা সাধারণত পরীক্ষার ফল, জিপিএ, পাসের হার কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির প্রতিযোগিতাকে সামনে রাখি। ক...

Copyright Dhaka Probe

অনলাইন সংস্করণ পড়তে ভিজিট করুন: <https://www.dhakaprobe.com/opinion/harano-sonali-sei-dinguli-2>